OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 77 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 77 - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বিবর্তিত পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গণেশ যোদ্দার
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: joddarganesh@gmail.com
0009-0003-5957-4332

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Political Philosophy, Evolution of thinking in Literature and Personal Life, Communism, Leftism, Gandhism, Socialism, Applied Bengali Language Thinking, 'Bangalee Asmita'.

Abstract
When the present moves towards the future, leaving the past as a witness, it changes itself and reaches its end. In this change, even if the external structure changes, the ideological infrastructure remains intact. Then we do not call it change, but evolution. However, this evolution is not only an evolution of spatial geography and temporal dimensions; it is also an evolution of the mind and mood of the evolved person. Subhash Mukherjee is no exception of this thinking. He is a real example of such evolution. Not only in his political philosophy of life, but also in his literary-centered meditations, poet Subhash Mukhopadhyay did not follow a set path. He changed his opinion, but remained steadfast in his goal. He moved away from leftism ideology and joined hands with Gandhism. That is true. However, he did not abandon communism. Evolution is the law of the ideological universe. But we must see to it that, that evolved consciousness does not hurt the collective convictions. Subhash Mukhopadhyay is a skilled thinker-artist in this work.

Therefore, in the article under discussion, the primary intention of the author will be to create an outline of evolution in terms of Subhash Mukhopadhyay's criticism of life, social consciousness, political thought, poetic thought, poetic justice, linguistic thought, aesthetic sense etc. It is to be noted that more examples will be provided from the poet's various poems to authenticate the logical tradition of the discussion. However, for the purpose of presenting the subject matter of the article, various literary forms such as novels, letters or songs will also be used in addition to the poet's poems. And by the end of the article, following these steps, we will reach the evolved consciousness of poet Subhash Mukhopadhyay.

Discussion

পূর্বোক্তি : তাঁর কবিতা সংগ্রামের যেমন, তেমন সহানুভূতিরও। তিনি ব্যক্তি মানুষের কণ্ঠে শুনিয়েছেন সমষ্টি মানুষের প্রতিবাদী সুর। তিল তিল মরণেও তাঁর কবিতায় মেলে উদ্বেল জীবনপ্রীতি। শোনা যায় হাতুড়ি ও কাস্তের গান। লাল পতাকা

হাতে নতুন আশার উদ্দীপনায় সমষ্টির সচেতন প্রয়াস সূচিত করে গেছেন তিনি। তাঁর কবিতা আপামর শ্রমিক শ্রেণিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার বলিষ্ঠ প্রত্যয় দান করে। শোনায় ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মারণজয়ী আহ্বান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পঞ্চাশের মন্বন্তর যখন বাংলার জনজীবনে চরম আঘাত হেনেছিল তখন সেই মন্বন্তর-লাঞ্ছিত স্বদেশের ভয়াবহ দুর্দিনে উৎকণ্ঠা, আবেগ, সমবেদনা ও বিষণ্ণতা ঝলসে উঠেছিল তাঁর কবিতায়। এমনিভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিতা। একটি ঊষা ও একটি সূর্যাস্তের মাঝখানে যে গনগনে উঠোন, তিনি সেই অলৌকিক উঠোনের কবি। তিনি 'ভারতীয় কবিতার নাজিম হিকমত'। 'যত দূরেই যাই' না কেন, 'লাল টুকটুকে দিনের' 'অগ্নিকোণে' 'মিছিলের মুখ'কে খুঁজতে তাঁকে আমাদের স্মরণ করতেই হবে। 'লোকটা জানলই না' তাঁর পাঠকেরা তাঁরই লেখা 'চিরকুট'-এ 'মুখুজ্জের সঙ্গে আলাপ' করে ২০১৯-এ তাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য স্বাগত জানিয়েছিল 'সালেমানের মা'কে। 'পূর্বপক্ষ' এবং 'উত্তরপক্ষ' তাই আর একবার না হয় ময়দানে চলুন। 'কাল মধুমাস'। 'পায়ে পায়ে' 'যেতে যেতে' শুনব 'দীক্ষিতের গান', 'জনযুদ্ধের গান', 'সকলের গান'। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' 'আমার বাংলা'র 'বধু' শোনাবে একাকিত্বের 'জেলখানার গল্প'। তাই 'একটু পা চালিয়ে ভাই'। তবে চিনতে ভুলবেন না যেন, গল্পের ছলে যিনি আমাদের 'মে-দিনের কবিতা' শোনাবেন তিনিই কিন্তু নবযুগের কমরেড, তিনিই আবার 'বিবর্তিত পদাতিক' — সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ - ২০০৩)।

তবে আবহমান কাল ধরে চলে আসা প্রচলিত রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বযুদ্ধের গর্জনশীল বিষফনার নিচে দাঁড়িয়ে মিছিলে পা মেলানো মানুষদের প্রতিবাদী সত্তাকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন উত্তর-স্বাক্ষর সমাজ তার ফলভোগ করে চলেছে। নৈর্ব্যাক্তিক ভালোবাসার তীব্র সংরাগময় কাব্য রচনা করে তিনি কবিতার বলয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তা হল—নিয়ত দুঃখ ও সংঘর্ষের বেদনায় জন্ম নেওয়া প্রবল আলোড়নময় মানবেতিহাস। আকাশের চাঁদকে আজীবন বুর্জোয়াদের মায়া বলেই তিনি বিশ্বাস করে এসেছিলেন। রাজনীতিকে কখনও প্রতিষ্ঠান বানানোর খেলায় তিনি মেতে ওঠেননি। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল দেশাত্মবোধের সমার্থক এক দৃঢ় প্রত্যয়। পার্টি কর্মী ও কবির মধ্যে দূরত্ব রেখে নয়, ভাবের ধোঁয়াশায় 'সিল্যুয়েট' মূর্তি হয়ে নয়, সহজ সত্য স্পষ্টভাষণে এবং অকপট আত্মপ্রকাশেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব। অনেকস্থলে তাঁর কবিতা চড়া সুরে বাঁধা, কিন্তু সহজবোধ্য। অনেক ক্ষেত্রে ব্যঙ্গময়, কিন্তু ব্যঞ্জনাগর্ভ এবং আবেগের সংহত প্রকাশে আশ্চর্য রূপময়। কথনরীতিতে কবিতা লেখার এমন সুনিপুণ সার্থক কারুকলায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বস্তুত তাঁর কবিতা পাঠককে পড়তে বাধ্য করে।

তার উপর জীবনশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনোদিন মুখোশ পরেননি। কথার সুর বা অর্থের গৌরবে নয়, এক বিশুদ্ধ আন্তরিকতার দীপ্তিতে তাঁর কাব্য সমুজ্জ্বল। তাইতো একমাত্র তিনিই বলতে পারেন ফুল নিয়ে কাঙালপনার দিন শেষ। বলতে পারেন—

"ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুলকি—
যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না।"[১]

—আর এভাবেই তাঁর প্রতিটি কবিতা আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে নবযুগ আনয়নের স্বপ্ন, সাম্য-সৃষ্টির আগ্রহ, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবি।

আসলে অতীতকে সাক্ষী রেখে বর্তমান যখন ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়, তখন সে নিজেকে বদলাতে বদলাতে পরিণতিতে পৌঁছায়। এই বদলে বাহ্যিক কাঠামো পাল্টে গেলেও আদর্শগত পরিকাঠামো থাকে অক্ষুণ্ণ। তখন তাকে আমরা পরিবর্তন না বলে, বলি বিবর্তন। তবে এই বিবর্তন শুধু স্থানিক ভূগোল এবং কালিক মাত্রার বিবর্তন নয়; পাত্রের মন ও মেজাজের বিবর্তনও। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর ব্যতিক্রম নন। তিনি এহেন বিবর্তনের প্রকৃত উদাহৃতি। আলোচ্য নিবন্ধে

তাই তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা, সমাজবোধ, রাষ্ট্রদর্শন, কাব্যভাবনা, ভাষাচিন্তা প্রভৃতির নিরিখে বিবর্তনের রূপরেখাটি নির্মাণ করাই হবে নিবন্ধকারের প্রাথমিক অভিপ্রায়। উল্লেখ্য, আলোচনার যৌক্তিক পারম্পর্যের প্রামাণিকরণে অধিক দৃষ্টান্ত প্রদান করা হবে কবির বিভিন্ন কবিতা থেকেই। অবশ্য নিবন্ধের বিষয়গত উপস্থাপনের লক্ষ্যে কবির কবিতার পাশাপাশি উপন্যাস, চিঠি কিংবা গানের মতো সংরূপও ব্যবহার করা হবে। আর এসবের সোপান বেয়ে নিবন্ধের শেষে আমরা পৌঁছে যাব কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিবর্তিত চেতনালোকে।

বিবর্তিত পদাতিক : *কালের পুতুল*-এর নির্মাতা বুদ্ধদেব বসু একবার সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছিলেন—

> “সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ। হয়তো দুর্লক্ষণ।... এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।”[২]

—একে আমরা প্রশংসার ছলে নিন্দা বলতে হয়তো দ্বিরুক্তি করব না। তবে একটা বিষয় আমাদের সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন। সেটি হল, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভোগবাদে আচ্ছন্ন। সেখানে দেহবাদকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালের উচ্ছ্বাস বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় পরতে পরতে ধরা পড়ে। যেমন - *বন্দীর বন্দনা, দ্রৌপদীর শাড়ি* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। যেখানে আমরা কামকাতর যৌবনের দেহনির্ভর প্রেমভাবনাকে ব্যক্ত হতে দেখি। অন্যদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আসলে ‘শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না’। সমাজবিপ্লবের আগমনী গান। সেকারণেই আপদমস্তক কমিউনিজমে বিশ্বাসী সুভাষ মুখোপাধ্যায় কখনই ছকবাঁধা জীবনের নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে চাঁদ, ফুল, আকাশ, নীড়, পাখিদের অনুষঙ্গে প্রেমের কবিতা লেখেননি। অবশ্য লেখেননি বলা ভুল। কেননা যিনি মানুষে মানুষে সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তোলার প্রয়াসী; তিনি কি কখনও প্রেমহীন মানুষ হতে পারেন? তাছাড়া প্রেমিক না হলে কি কেউ বিপ্লবী হতে পারে? যে-পথে তিনি আর্ত পৃথিবীর ক্রমমুক্তি চাইছেন সে বিপ্লবের পথের শেষ গন্তব্যস্থল তো আসলে মানবিক প্রেম— তথা মানবপ্রেম। তাইতো তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক*-এর ‘মে-দিনের কবিতা’য় শোনালেন—

> “চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
> গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—
> তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
> জীবনকে চায় ভালবাসতে।
>
> প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে
> মারণের পণ নখদন্তে;
> বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে,
> উজ্জ্বল দিন দিক্‌-অন্তে।”[৩]

আর এই একই ব্যাজস্তুতির কারণে কবি আত্মবিবর্তন করেন। তবে কি, নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার বিবর্তন স্রষ্টা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজে উপলব্ধি করতে পারেন না। স্রষ্টার বিবর্তনের স্তর-পরম্পরা তার ভোক্তারাই অনুধাবন করতে পারেন। যদিও স্রষ্টা নিজের সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পর তার সৃষ্টির বিবর্তনকে যথার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কোনও কবি বা স্রষ্টা আপন আপন সৃষ্টি থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যেতে পারেন না। তাহলে আমরা দেখলাম ‘আত্ম-অনন্বয়’ (self-detachment) কখনই সম্ভব নয়। তবে সৃষ্টি-রসজ্ঞ যিনি, তিনি আপন কবি-আত্মার সঙ্গে অন্বিত থেকেও নিজেকে আলাদাভাবে বিচার করতে সক্ষম হন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই ধরনের কবি-সত্তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যৌবনের প্রথম থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের শুধু যে বিশ্বাসী ছিলেন তাই নয়, তিনি দীক্ষিত ছিলেন। এমনকি সেই মতবাদের বিরোধীদের বিরোধিতায়ও তিনি ছিলেন অনমনীয় এবং আপোসহীন। কিন্তু আকস্মিকভাবেই পূর্ববর্তী আদর্শগত যে মূল্যবোধ তা বিসর্জন দিয়ে বিপক্ষ শিবিরে একান্ত অসহায় ভাবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 77 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাম লেখান তিনি। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন 'পদাতিক কবি'; শেষ জীবনেও তিনি ছিলেন 'পদাতিক'। কিন্তু আমরা একটু বিশেষিত করে তাঁর এই মতাদর্শগত মূল্যবোধের বিবর্তনের সাপেক্ষে তাঁকে বলতে পারি 'বিবর্তিত পদাতিক'। কেননা, পদাতিক পর্বে আমরা দেখেছি তাঁর কবিতা রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত। সেই তুলনায় *অগ্নিকোণ, চিরকুট, ফুল ফুটুক* প্রভৃতি *পদাতিক* পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতায় আমরা রাজনীতির উদ্দীপনা অনুভব করি।

সময়ের সুরে ও সংকটে : সমকালীন ভারতের জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'প্রস্তাব: ১৯৪০' শীর্ষক কবিতার ভাবে ও ভাষায়। ভারতীয় জনমানস সেই সময় সর্বতোভাবে মৃত্যুভয় জয় করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। লাল উষ্কির মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট রূপ ও স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছিল। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির নেতা মহাত্মা গান্ধীর উপর আস্থা রেখে সমগ্র জাতি সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর বলে উঠেছিল—

"প্রভু, যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করব না; নেব তীর ধনুক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি তোড়াই;
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।"[৪]

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন সমগ্র দেশবাসীকে হতাশ করেছিলেন। তাদের আপোসনীতি জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঢেউ তুলেছিল। ব্রিটিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আপোসনীতি ও দুর্বল মনোভাবকে কবি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শানিত অস্ত্রে আঘাত হেনেছিলেন—

"হে সওদাগর, সেপাই-সান্ত্রী সব তোমার;
দয়া করে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও —
তারপরে প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার,
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।"[৫]

তবে বিশ শতকীয় মানবতার বিপন্ন মুখচ্ছবি তথা সময়ের স্বর ও সংকটকে স্পষ্টভাবে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে ধরতে গেলে সময়গত বিন্যাসকে ও ঘটনাপুঞ্জকে আমাদের বুঝে নেওয়া আবশ্যক—

১৯৩৯-১৯৪৫	: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মৃত্যুর ভয়াল ছায়ায় মনুষ্যত্বের অধঃপতন
১৯৪১	: সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু
১৯৪২	: ভারত-ছাড়ো আন্দোলন
১৯৪৩	: পঞ্চাশের মন্বন্তর
১৯৪৬	: সম্প্রদায়িক দাঙ্গা
১৯৪৭	: স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগ
১৯৪৮	: গান্ধী হত্যা
১৯৫০	: প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

—আর এহেন সংকটময়তা থেকে শুধু ভারতবর্ষে নয়; ইন্দোনেশিয়া থেকে অ্যাবিসিনিয়া, জর্জিয়া থেকে হিস্পানি মুলুক হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত নিপীড়িত মানুষের আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াইতে অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদের দালালদের তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। আসলে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭-এর কালবেলায় ভারতীয় রাজনীতিতে যখন মূলত সম্প্রদায়িকতাই হয়ে উঠেছিল রাজনীতির প্রধান প্যারাডাইম, তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতির বাইরে তৃতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। রাজনীতির প্রত্যক্ষতার তাপে পুড়ে যেতে থাকলেও বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে কমিউনিস্ট পার্টি একটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভাবনার জমি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 77 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তৈরি করে ফেলেছিল। আর এই পটভূমিতেই আরও অনেকের মতো কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে প্রাণে জেগে উঠল 'লাল প্রত্যয়' এবং লাল উঙ্কিতে পরস্পরকে চেনার চোখ। তাইতো সাম্রাজ্যবাদের দালালদের চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে সত্যের পথে পা রাখার প্রত্যয় জাগান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার *কাল মধুমাস* কাব্যের 'হাত বাড়ালে' নামক কবিতায়—

"রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটছে
নিষ্ঠুর সময়
সারা পৃথিবীকে টানছে
রসাতলে
এখনও আকাশচুম্বী ভয়।
অথচ সামনেই আর একটু হাত বাড়ালে
রয়েছে বন্ধুর হাত,
সুখ শান্তি
বাঞ্ছিত জগৎ— "[৬]

সুভাষিত কথা : গানের সুরে : আধুনিক কবিদের গানের ভাণ্ডার তুলনায় কম। সঙ্গীতপ্রেমীদের অনেকের আক্ষেপ আধুনিক কবিরা গান লেখেন নি বলে। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা বলতে পারি আধুনিক কবিদের খাতায় গানের কলি ফুটে ওঠেনি বটে; তবে তাঁদের অনেকেরই কবিতার কথায় সুর সংযোজিত হয়ে বাংলা আধুনিক গানের জগতকে ভরিয়ে তুলেছে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিভিন্ন কবিতায় সলিল চৌধুরীর অসামান্য সুরারোপের কথা। সেই সাফল্যের ইতিহাসে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও আর এক নতুন সংযোজন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখনও হেমন্ত হয়ে ওঠেননি। তিনি লিখতেন কবিতা। আর বন্ধু সুভাষ গাইতেন গান। চাকা গেল ঘুরে। কলেজের সহপাঠী গায়ক-বন্ধু সুভাষের প্রেরণায় ও তাগাদায় হেমন্ত আকাশ বাণীতে গান গাইতে গেলেন। গীতিকার সুভাষ। কথা— 'আমার গানে এলে চিরন্তনী।' এরপর ১৯৪৩। গণনাট্য সংঘ ইতিমধ্যে জন্ম নিয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর তরী হতে তীর গ্রন্থে জানাচ্ছেন— সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জনযুদ্ধের গান' নামক কবিতার কথায় সুর দিয়ে বিনয় রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গাইলেন 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' গানটি। তবে 'নবজীবনের গানে'র স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুর দিয়েছিলেন কবির একাধিক কবিতায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মে দিনের কবিতা'র গীতিরূপ 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'। যা শুনে বাঙালি-অবাঙালি সকলের মনে ও প্রাণে বিদ্রোহের দোলা জাগিয়ে দিয়েছিল। কবিতার কথায়— "এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা/ দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য/ চিনে-নেবে যৌবন আত্মা"— এটি পূর্ণতা পায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরারোপেই। পরবর্তীকালে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ও 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' গানটি সুরারোপ করেন। তাতে কবিতার দীপ্তি, মেজাজ আরও প্রগাঢ়তা পায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নব্বই বছরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কার্জন পার্কে কবির কথায় সুর মিলিয়ে গাওয়া হয়েছিল— 'ওঠো, উঠে দাঁড়াও'। গানটির সুর ও কথা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ বাহিত হয়ে সকলকে স্পর্শ করেছিল। আবার রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী সলিল চৌধুরী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ' কবিতার অংশবিশেষ নিয়ে সুর করলেন— 'অগ্নিকোণের তল্লাট হয়ে দুরন্ত ঝরে তোলপাড় কালাপানি।' হয়তো রেকর্ড হয়নি, তবুও গানটি গণনাট্য সংঘে প্রতিবার গাওয়া হয়েছে। এমনকি 'যেতে যেতে' কবিতাটির "তারপর যেতে-যেতে-যেতে/ এক নদীর সঙ্গে দেখা/ পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা/ পরনে উড়-উড়ু ঢেউয়ের নীল ঘাগরা"— এই কথায় সলিল চৌধুরীর সুরে ও ছন্দে গান পাগলদের মন ছুঁয়ে যায়। এমনি বাংলা আধুনিক গানের ভাণ্ডারকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তবে গ্রামোফোন কোম্পানির ক্যাসেটে (১৯৯০) গীতিকার সৈকত মিত্রও অসামান্য গীতিশৈলী সম্পাদনা করেন।

আবার উমাপ্রসাদ মৈত্রের *জয় বাংলা* ছবিতে গীতিকার সুধীন দাশগুপ্ত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একাধিক কবিতা ব্যবহার করেন। তার মধ্যে "স্ট্রাইক স্ট্রাইক পথে পথে আজ হোক মোকাবিলা/ দেখি কার কত শক্তি"— এমন সদম্ভ উচ্চারণ প্রাণ পায় সুধীন দাশগুপ্তের সুরে ও ছন্দের সমবেত কণ্ঠের ধ্বনিতে। তবে 'লাল টুকটুকে দিন' কবিতাটি

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুশীল মল্লিকের কণ্ঠে 'তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ' গান হয়ে বাজে। এমনকি গীতিকার-সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায় 'দেখো দেখো দিন বদলায়' গানে সুর দিয়ে তা সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত করে থাকেন।

অন্যদিকে বিখ্যাত পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর *জীবনসঙ্গীত (১৯৬৮)* ছবিতে কবি-সুহৃদ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মরমী কণ্ঠে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছাপ' কবিতাটি "কেউ দেয়নি কো উলু, কেউ বাজায়নি শাঁখ"— এই গানের সুরে অসামান্য সাফল্য এনে দিয়েছিল। তাছাড়া গানটির হৃদয়স্পর্শী সুর ও গায়ন কবিতার গভীরতাকে সহজভাবে ছুঁতে সাহায্য করেছিল।

এর পরপর দু'বছর (১৯৬৯ ও ১৯৭০) শারদীয় পুজোর গানে গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে মাধুরী চট্টোপাধ্যায় সুভাষের কবিতার গীতিরূপ শুনিয়ে সকল শ্রোতাদের মন কেড়ে নেন। অন্যদিকে "ফুল ফুটুক না ফুটুক" (১৯৭৬) এবং "অন্ধকার পিছিয়ে যায় দেওয়াল ভাঙে বাধার" (১৯৭৭)— গান দুটি গীতিকার-সুরকার-শিল্পী জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সুরে সেদিনের আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলেছিল। তাছাড়া 'মাথার উপর খাটানো নীল' (১৯৭৭) কবিতা মেজাজে সুর করেন গীতিকার ও সুরকার প্রবীর মজুমদার। প্রবীরের কণ্ঠে অনেকটা আমরা লোকায়ত সুর অনুভব করেছিলাম। সুরকার মৃণাল বন্দোপাধ্যায়ের সুরে ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আবার রেকর্ড হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতার গীতিরূপ "যখন ডাকি আয়রে পাখি" গানটি। আবার একাধিক কবিতার অংশবিশেষে যেমন 'ঘোষণা', 'চীরবাসে বীর' প্রভৃতি কবিতার মিশেলে গড়ে ওঠে 'এ দেশ আমার গর্ব' গানটি। তেমনি বিভিন্ন কবিতায় ছড়ানো স্লোগান সংগঠিত করে তৈরি হয় "রাতারাতি নয় দিনেদিনেই হয়/ করতে কোনও কাজ হাত লাগাতে হয়" গানটি; যার সুরারোপ করেন প্রবীর মজুমদার। পাশাপাশি উষা উত্থুপের 'মাথার উপর কালো পাথরটার', ইন্দ্রানী সেনের 'ফুলের পাপড়ি ঝরে', শ্রীকান্ত আচার্যের 'ফুলগুলো সরিয়ে নাও', ইন্দ্রনীল সেনের 'ছুটি আমার ছুটি', অভিরূপ গুহঠাকুরতার 'রাতারাতি নয়' প্রভৃতি গানগুলি আসলে সুভাষিত কথা (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার) গীতিরূপ; যা আজও আমাদের মনে বাজে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পুব হওয়ার গান' কবিতাটির গানের রূপান্তর 'যেখানে মাটি রক্তে ভেজা'— আসলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ্যে রচিত।

আবার আমাদের মনে পড়ে সমীর চট্টোপাধ্যায়ের সুরে লোপামুদ্রা মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া "বাঁদিকের বুক পকেটটা সামলাতে সামলাতে" গানটি আসলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'লোকটা জানলই না' কবিতার গানের রূপান্তর। অনুবাদ কবিতাতেও গীতিরূপ অসামান্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃত নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ 'নতজানু হয়ে আমি' যখন গীতিরূপ পায় তখন অনাথবন্ধু দাসের সেই সুর আমাদের আরও হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

অবশ্য তাঁর সমস্ত কবিতার গীতিরূপ কিন্তু সফলতা পায়নি। কেননা, কবিতার গীতিরূপে কথার চাহিদার সমান্তরালে সুরের আকাঙ্ক্ষা ও শ্রোতার মন আকর্ষণ করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। সেক্ষেত্রে কোথাও সুরের অভাব, আবার কোথাও কথার অভাব ধরা পড়ে। তবুও বলতে হয়, কথা ও সুরের মেলবন্ধনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার গান আধুনিক গীতিমাল্যের একটি অন্যতম প্রস্ফুটিত প্রসূন।

কাজের বাংলার সুভাষ মুখোপাধ্যায় : এক অনন্য ভাষা-চিন্তক : কবি মাত্রই শব্দ সচেতন। প্রতিটি শব্দের যাথার্থ ও তাদের উপস্থাপন কৌশলের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে স্ব-স্ব কবিদের ভাষাশৈলী। কবির ভাষা তাঁর চিন্তনেরই প্রকাশ। তাছাড়া ভাষা কি কেউ সৃষ্টি করে? ভাষাই তো কবিকে গড়ে তোলে। ভাষার রং ও চিত্রের মাধ্যমে আমরা কবির কল্পনা ও তাঁর মননশীল মনের পরিচয় পাই। সেদিক থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনন্য ভাষাচিন্তক। তাঁর ভাষাচিন্তার প্রকাশ ধরা পড়ে *কথার কথা* (১৯৮৪), *অক্ষরে অক্ষরে* (১৯৫৪) ও *কাজের বাংলা* (২০০২)- এই বই তিনখানির মধ্য দিয়ে। সাধারণের উঠোনে নেমে কবি আত্মস্থ করেছিলেন সাধারণ মানুষদের কথনভঙ্গি, ব্যবহৃত চলতি বুলি, প্রবাদ-প্রবচন, লোকাচার, লোককথা, এমনকি সহজ সরল আলাপনের ভাষারীতি ও সাধারণের মনের অন্তরঙ্গ কথাটিও। তাই শতবর্ষ অতিক্রম করার পরেও ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরের স্বাতন্ত্র্যধর্মী, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা, চল্লিশের কমিটেড প্রত্যয়ী পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈলীকুশলী ভাষাচিন্তক হিসেবে আধুনিক ভাষা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে নিঃসংশয়ে স্মর্তব্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 77 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তবে ভাষা শুধু আবেগে বাঁচে না। ভাষা বাঁচে তার রকমারি ব্যবহারে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বিভিন্ন প্রবন্ধ* গ্রন্থের 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন—

> "যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"[৮]

—আর সেকারণেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দনীয় ভাষাকে, সমর সেন ও বিষ্ণু দের ভাষাকে প্রত্যাহার করে কাব্যের মধ্যে আমজনতার ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন। *অক্ষরে অক্ষরে* গ্রন্থের প্রথমেই ভাষার অর্থ প্রতিপাদন প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

> "আমি জানালে পরে তবেই তুমি জানতে পারো। না জানালে কেমন করে জানবে? জানাবার এই উপায়টির নামই ভাষা।"[৯]

তাঁর মতে ভাষার উপাদান হল শব্দ বা কথা। তাই বাংলা ভাষা থেকে পরিচিত শব্দ বেছে নিয়ে কবি দেখাবার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন আওয়াজের মধ্য দিয়ে কীভাবে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি নির্মিত হয়। শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে সে-বিষয়ে তিনি সন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একেবারে প্রথম দিকে মানুষ সম্ভবত পশু-পাখির আওয়াজ নকল করে তার প্রয়োজন মতো শব্দ গড়ে নিত। সমাজ সেই শব্দ মান্যতা দিল। তখন শব্দটি ভাষার মধ্যে অবস্থান করার বা ভাষার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার অধিকার অর্জন করল। মূল ধাতুর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠলো 'ভাষার বুনিয়াদ'। তবে শব্দ কোন্ নিয়মে পাশাপাশি বসবে তা ঠিক করবে ব্যাকরণ। কেননা কবির মতে 'ভাষার লাগাম' হল ব্যাকরণ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষিক দর্শন বা বীক্ষণ বস্তুত সামাজিক ইতিহাস ও ভাষার বিকাশের ইতিবৃত্তের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত। সেকারণে *অক্ষরে অক্ষরে* গ্রন্থের 'জীবনের ছাপ' প্রবন্ধে তাঁর অভিমত—

> "ভাষার মধ্যে অনেক অতীত ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। হাজার হাজার বছর আগে মানুষের জীবনের ধরন-ধারণ এবং ধ্যান-ধারণা কীরকমের ছিল, ভাষার মধ্যেই তার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষা যেমন সমাজকে ধরে রাখে, মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়— তেমনি আবার ভাষার উপর ভর করে সমাজও এগিয়ে যায়।"[১০]

আবার সরকারি কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের জন্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সোচ্চার হন *কাজের বাংলা* গ্রন্থে। ঔপনিবেশিক পরভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার দাসত্ব ও মোহ ঘুচিয়ে আমাদের মুখ ঘুরাতে হবে জাতীয় ঐতিহ্যের বিপুল ভাণ্ডারে। তাঁর মতে, প্রশাসন আর প্রজার মধ্যে সেতু বাঁধতে পারে কেবল মাতৃভাষা। স্বাধীনতা লাভের আটাত্তর বছর পরেও আমাদের রাজ্যে তো বটেই ভারতবর্ষে কোনও সুস্পষ্ট ভাষা-নীতি গড়ে ওঠেনি। সংযতভাবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাই তাঁর *কাজের বাংলা* গ্রন্থের 'ভাষানীতি' প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন—

> "রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় বা অন্য রাজ্যের সরকারের কাছে কেন আমি মাতৃভাষায় আমার কোনও বক্তব্য জানাতে পারব না।"[১১]

আসলে বাংলা ভাষাকে জ্ঞানের ভাষা, কাজের ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। দেশের চিত্তকে সরল, সফল ও সমুজ্জ্বল করতে একমাত্র আপন ভাষাই প্রয়োজন। তাই সংস্কৃতির ঐক্যে এই মনের সম্পদকে শক্তিশালী করে তুলতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সর্বোতভাবে তন্নিষ্ঠ হয়েছিলেন বাংলা ভাষাকে সরকারি কাজে ব্যবহার করার জন্য। আর এইখানে এই ভাষাচিন্তক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম কৃতিত্ব।

চিঠির দর্পণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় : চিঠি যিনি লিখছেন শুধু তিনিই নন; যাকে লেখা হচ্ছে সেই চিঠি তার অর্থাৎ পত্র-প্রাপকের রুচি, মন আর মননও অনেকখানি লিখে নেয় একটি চিঠি। সেই দিক থেকে *চিঠির দর্পণে* গ্রন্থখানি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এক অভিনব পরীক্ষামূলক গদ্য। এক আশ্চর্য নিরীক্ষা। এ-বইয়ের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেন গ্রন্থকর্তা বা লেখক নন; যেন তিনি এক পত্র-গ্রন্থীক। পরিবর্তমান মানবসভ্যতার মধ্যে *চিঠির দর্পণে* বইটি যেন বিস্মৃতির এক বিরাট

আর্কাইভ। 'চিঠিগুলো থাকবে না এই ভয় থেকেই হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল' — এই 'আইডিয়া' থেকেই *চিঠির দর্পণে* গ্রন্থের জন্ম। নামও বেশ ব্যঞ্জনগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে কবির নিজের কথাই শোনা যাক —

> "দর্পণ। তবে সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব নয়। আবার স্থিরচিত্রও নয়। চিঠির পৃষ্ঠপটে ফুটে ওঠা এক সবাক চলচ্চিত্র। যা অনুপস্থিত তার ছবি।"[১২]

ইন্টারনেট দুনিয়ায় আছে গতির আনন্দ। কিন্তু যতির আয়েস সেখানে নেই। সেটা পেতে গেলে খুঁজতে হবে পুরনো চিঠির বাক্স। কত ধরনের মানুষের গতায়াত এই *চিঠির দর্পণে* গ্রন্থের পাতায়। কখনও স্বয়ং লেখক আবার কখনও তিনি অন্যের চিঠিতে উল্লেখিত চরিত্র হিসেবে আমাদের মানস দর্পণে প্রতিভাত হয়ে থাকেন। এছাড়া ব্যক্তি প্রসঙ্গের বাইরে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমসাময়িক চলমান সময়ের ঘটমান বর্তমান বিবরণীর অনুভূতিমালা হল এই *চিঠির দর্পণে* গ্রন্থখানি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা চল্লিশের অন্তিমলগ্নের আর পঞ্চাশের দশকের বঙ্গীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, বিভিন্ন প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেপথ্য কাহিনির এক বিরাট বিচিত্র চিত্রশালাকে অবলোকন করি এই *চিঠির দর্পণে* গ্রন্থে। তাছাড়া পত্রলেখক ও পত্রপ্রেরকের ভাবপ্রকাশক শব্দমালা ও গদ্যভাষাকে ছিন্ন ছিন্ন পত্রের বিনিসুতোয় জুড়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের হাতের লেখার বিচিত্র প্রদর্শনী। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে নজর রাখলে আমরা কবিতার ভাষা সম্পর্কে লেখকের অনুচিন্তনকে ধরতে পারব—

> "পোশাকি শব্দ বিলকুল বাদ দিয়ে শুধু আটপৌরে শব্দ দিলেই কি কাজ হাসিল হয়ে যাবে? আমার তা মনে হয় না। পুরুষ পরম্পরাকে এক সূত্রে বেঁধে দেয় যে ঐতিহ্য, কবিতায় তাকে যদি আমরা আত্মস্থ না করি, আমাদের দশা হবে নিজে বাসভূমে পরবাসীর মতো। লোকের মুখের ভাষার যে জাদু থাকে, সেটা কবিতায় উঠিয়ে আনতে হবে। শব্দে ফোটে সুরেলা ছবি। বেশি কথাকে কম কোথায় আঁটানো, কথায় রং ফলানো, নিরাকারকে আকার দেওয়া, কথায় কথায় জুড়ে মানুষকে নিশানা দেখানো— লোকমুখের ভাষার ধর্মই তো এই।"[১৩]

ঔপন্যাসিক সুভাষ : 'কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান ভূমি? কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে তাহলে তিনি বলবেন জীবনের পাহাড় - সাগরের কথা?' অচিরেই সুভাষ তাঁর উত্তর দিলেন— 'মানুষ'। আর সেই মানবিক অধিষ্ঠানভূমির অন্বেষণ শুধুমাত্র কবিতার মধ্যেই করেননি; উপন্যাসের প্রেক্ষণবিন্দু হয়ে উঠেছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অধিষ্ঠানভূমি তথা সাহিত্যচিন্তার ভূগোল।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে পাঁচটি উপন্যাস জন্ম নিয়েছে। সেগুলি হল, যথাক্রমে— *হাংরাস* (১৯৭৩), *কে কোথায় যায়* (১৯৭৬), *অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ* (১৯৮১), *কাঁচা পাকা* (১৯৮৯) ও *কমরেড কথা কও* (১৯৯০)। এছাড়া তাঁর সাত-আটটি গল্প মেলে। তার প্রথমটি ১৯৩৭-এ প্রকাশিত *মৈত্রী* পত্রিকায় এবং সম্ভবত শেষ তিনটি ১৯৮৭ সালের শারদীয় *আজকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ভারতে তথা বাংলায় গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মানুষের সংযোগ এবং একটি দীর্ঘ হাঙ্গার-স্ট্রাইকই *হাংরাস* উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাসটি অনেকাংশে আত্মজৈবনিক। অরবিন্দ ও বাদশার জবানিতে লেখক আপন ছাত্র-রাজনীতি থেকে বামপন্থী সক্রিয় রাজনীতির উত্থান-পতনকে তুলে ধরেছেন।

আবার *কে কোথায় যায়* উপন্যাসে চা-বাগানের শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে তেত্রিশ বছর মাটি কামড়ে পড়েছিলেন—এমন একটি চরিত্র উপেন মজুমদারের আশা, হতাশা ও নৈরাশ্যকে বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া এর মধ্যে আছে সহায়-সম্বলহীন মানুষ কিভাবে মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে জীবনের অধিকাংশ সময় বিলিয়ে দিতে পারেন তারই এক মর্মন্তুদ কথা ও কাহিনি।

অন্যদিকে *অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ* উপন্যাসটির কাহিনি প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার চিত্রল বর্ণনা না হলেও কাল্পনিক কোন কাহিনিও নয়। হারিয়ে যাওয়া এক ইংরেজি পাণ্ডুলিপির পুনঃপ্রাপ্তির পর প্রকাশকদের বিড়ম্বনা ও ব্যবসায়িক উপেক্ষা এবং লেখক-জীবনের আর্থিক সংকট এই উপন্যাসে অত্যন্ত শৈল্পিক চেতনায় বিন্যস্ত। উপন্যাসটিতে প্রতীকত্ব আছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 77 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শরীরের রোগ যাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সমাজ থেকে, সভ্য সমাজ যাদের ঘৃণায় সরিয়ে দিয়েছে দূরে, তাদের চোখ দিয়ে তথাকথিত উত্তর-স্বাক্ষর নাগরিক সভ্যসমাজকে দেখা ও চেনা; সভ্যতার অসুখের গভীর গভীরতর ক্ষতগুলিকে দগদহে হয়ে ফুটে ওঠার মর্মস্পর্শী ছবি হল *অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ* উপন্যাসটি।

আসলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনের ভিতর শিল্পী মানুষটির মানবীয় অনুভবের শিকড় ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। লেখক-জীবনের অর্থাৎ যৌবনের কাঁচা অভিজ্ঞতাগুলি ও অপরিণত জীবনের শিল্পীর অপরিণত অভিজ্ঞতারাজি যথার্থ শিল্পের মতো পাকা অভিজ্ঞতায় রূপদানের প্রয়াস লক্ষিত হয় *কাঁচা-পাকা* উপন্যাসে। প্রধান চরিত্র কচি। বয়সে কিশোর। বাবা নেই। উপার্জনের উৎস একমাত্র মা। কিন্তু মায়ের মেলামেশার লোকটিকে কচির সহ্য ক্ষমতার বাইরে। অথচ টাকার জন্য সেই লোকটির দয়া-দাক্ষিণ্য সহ্য করতে বাধ্য হতে হয় তাকে। আর এই কচি বিচিত্র জীবনের কাঁচা-অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে নানান চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে কিভাবে সে জীবনের পাকা-অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে নিজেকে দাঁড় করাবে সেই কথা ও কাহিনি *কাঁচা-পাকা* উপন্যাসের মৌল উপজীব্য বিষয়।

উপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর *কমরেড, কথা কও* উপন্যাসটি। আদ্যন্ত আত্মজবানীতে লেখা। উপন্যাসটি মূলত লেখকের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান; পার্টি ত্যাগ; পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান, জেলখাটা, শ্রমিকদের বস্তিতে যাতায়াত ও যোগাযোগ রাখা— সবমিলিয়ে একটি বিশেষ সময়ের রাজনীতি-সংক্রান্ত জীবন-দর্শন এবং একসঙ্গে শিল্পীর জগত ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা চিত্রাল্পনার মিশেলে সৃষ্টি তাঁর *কমরেড, কথা কও* উপন্যাসটির কাহিনি। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বোধ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ করে অহৈতুকী রস সৃজন ও সাহিত্য নির্মাণের নিরিখে উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিবৃত্তে এক অভিনব সংযোজন। রাজনৈতিক প্রত্যয়, মানবিক প্রত্যয় এবং শৈল্পিক প্রত্যয়— এই ত্রিবিধ প্রত্যয়কে একত্রিত করে *কমরেড, কথা কও* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন যথার্থ ‘প্রত্যয়ী পথিক’।[১৪]

শেষোক্তি : রাজনীতি-সংক্রান্ত জীবন-বোধে যেমন সাহিত্যকেন্দ্রিক অনুধ্যানেও তেমনি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটানা ছকে বাঁধা পথে চলেননি। গতিপথ বদলেছেন, কিন্তু লক্ষ্যে থেকেছেন অবিচল। কমিউনিস্ট ভাবধারা থেকে সরে এসে গান্ধিবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তিনি। ঠিক কথা। তবে বামপন্থাকে ছাড়েননি। বিবর্তন ভাববিশ্বের নিয়ম। কিন্তু দেখতে হবে সেই বিবর্তিত চেতনা যেন সমষ্টির প্রত্যয়ে আঘাত না লাগে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই কাজে সুদক্ষ চিন্তন-কারিগর। তাইতো কী কাব্য-ভাবনায়, কী ভাষাচিন্তায়, কী ছন্দোসৃজনে, কী শিশু সাহিত্যের পাতায়, কী গানে, কী উপন্যাসে— সর্বত্রই সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রজাপতি সন্ধানী কবিমাত্র নন; তিনি যথার্থই ‘নবযুগের কমরেড’— প্রকৃত অর্থে ‘বিবর্তিত পদাতিক’।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ‘পাথরের ফুল’, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা;* কলকাতা: দে’জ পাবলিশার্স, পরিমার্জিত পঞ্চম সং, ১৩৯৩; পৃ. ৬৫

২. বসু, বুদ্ধদেব, ‘পদাতিক’ (প্রবন্ধ), *কালের পুতুল;* কলকাতা: নিউ এজ, ১৯৫৭; পৃ. ৮০-৮১

৩ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ‘মে-দিনের কবিতা’, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা;* প্রাগোক্ত, পৃ. ১৫

৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ‘প্রস্তাব: ১৯৪০’, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা;* প্রাগোক্ত, পৃ. ১৭

৫. তদেব, পৃ. ১৮

৬. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ‘হাত বাড়ালে’, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা;* প্রাগোক্ত, পৃ. ২৫

৭. স্বপন সোম, *এই সময় পত্রিকা,* ৪ মার্চ, ২০১৮

৮. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.); ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’, *বিবিধ প্রবন্ধ,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২০৭

৯. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *অক্ষরে অক্ষরে,* কলকাতা: দে’জ পাবলিশার্স, ১৯৫৪, পৃ. ১০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 77 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১০. তদেব, পৃ. ২০

১১. ঐ, *কাজের বাংলা,* কলকাতা: স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ১৮

১২. ঐ, *চিঠির দর্পণে,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৬; পৃ. ৯

১৩. তদেব, পৃ. ২৭৬

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা কবিতার কালান্তর,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সং, ২০০৮; পৃ. ২২৬